পাগলা ঘন্টি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আশ্বিনদিবসে

আশ্বিন বলতেই চোখে ভেসে ওঠে রোদ্দুরের ছবি,
চক্রাকারে চিল
মাথার উপর দিয়ে ডানা মেলে
উড়ে যায়
মেঘের জানলার দিকে। আশ্বিন বলতেই
আলোর-তরঙ্গে-ধোয়া দৃশ্যাবলি চোখের সমুখে
দেখতে পাই।
দেখি নদী, দেখি নৌকা, গেরুয়া বাদাম
স্রোতের দুরন্ত টানে ঘুরে যায়।

এমন আশ্বিন ছিল একদা, এখন
বাহির-পৃথিবী থেকে তাড়া খেয়ে ভিতরে ঢুকেছে।
বাহিরে আঁধার।
লোভী, জেদি, কবন্ধ রজনী তার
সীমানা বাড়িয়ে চলে আশ্বিন-দিনেও।
আমি নিরুপায় তার মধ্যে বসে থাকি, আমি ঠিকই

টের পাই
বুকের ভিতর দৃশ্যাবলি পুড়ে যায়।

আশ্বিনদিবসে

আশ্বিন বলতেই চোখে ভেসে ওঠে রোদ্দুরের ছবি,
চক্রাকারে চিল
মাথার উপর দিয়ে ডানা মেলে
উড়ে যায়
মেঘের জানলার দিকে। আশ্বিন বলতেই
আলোর-তরঙ্গে-ধোয়া দৃশ্যাবলি চোখের সমুখে
দেখতে পাই।
দেখি নদী, দেখি নৌকা, গেরুয়া বাদাম
স্রোতের দুরন্ত টানে ঘুরে যায়।

এমন আশ্বিন ছিল একদা, এখন
বাহির-পৃথিবী থেকে তাড়া খেয়ে ভিতরে ঢুকেছে।
বাহিরে আঁধার।
লোভী, জেদি, কবন্ধ রজনী তার
সীমানা বাড়িয়ে চলে আশ্বিন-দিনেও।
আমি নিরুপায় তার মধ্যে বসে থাকি, আমি ঠিকই
টের পাই
বুকের ভিতর দৃশ্যাবলি পুড়ে যায়।

চতুর্দিকে অন্ধকার

চতুর্দিকে অন্ধকার, তারই মধ্যে এখানে-ওখানে
কয়েকটি বাড়িতে
আলো জ্বলে,
টিভি চলে,
হাস্যমুখে ভাষ্যকার বলে–
বিদ্যুতের উৎপাদন আজ বিকেলে যথেষ্ঠ ছিল না।

যারা শোনে, তারা ভাবে, বটে?
যেমন সংবাদপত্রে, তেমনি দেখছি টিভিতেও রটে
উল্টাপাল্টা গুজব!–তাদের
ফ্রিজের ভিতরে
ল্যাংড়া আমি, মাখন, সন্দেশ, ডিম, ব্রয়লার চিকেন
টাটকা থেকে যায়।

চতুর্দিকে অন্ধকার, তারই মধ্যে একটি-দুটি শৌখিন পাড়ায়
আলোর বন্যায় ভাসতে থাকে
বাড়িঘর।
ঐগুলি কাদের বাড়ি? সম্ভবত ঈশ্বরের তৃতীয় পক্ষের
পুত্র ও কন্যার।

কে যেন বলতেন, "আগে সম্পদ বাড়াও,
তা নইলে দারিদ্র্য ছাড়া আর
কিচ্ছুই দেখছি না...ইয়ে...
বন্টন করবার মতো।"

তখন বক্তৃতা শুনে হাততালি দিতুম,
প্রত্যেকে ভাবতুম,
এ-সবই যৎপরোনাস্তি যুক্তিযুক্ত কথা।

সত্যিই তো, দেশে
সম্পদ যদি না বাড়ে, কী হবে দারিদ্র্য বেঁটে দিয়ে।

হিসেবে গরমিল ছিল, সেইটে বুঝে শেষে
ইদানীং আমরা কিন্তু তাতেই সম্মত।
তেত্রিশ বছর ধরে প্রতীক্ষায় থাকতে-থাকতে হাড়ে
দুব্বো গজাবার বেশি বাকি নেই।
সেই কারণে বলছি, আপাতত
যা বণ্টন করা যায়, তা-ই করুন, এই
দারিদ্র্যই বাঁটা হোক, তার সঙ্গে অন্ধকারও হোক।
অবস্থা যা দেখছি, তাতে সর্বাঙ্গীণ সেটাই মানাবে।

চতুর্দিকে অন্ধকার, তারই মধ্যে ইতস্তত আলো
দেখতে-দেখতে ইদানীং
একটাই ভাবনা জাগে; মনে হয়,
এর চেয়ে বরং
সবাই একসঙ্গে অমবস্যার ভিতরে ঢোকা ভাল।
একসঙ্গে আনন্দ করা ভাগ্যে যদি না-ই থাকে তো শোক
সবাই একসঙ্গে করা যাবে।

না রাম, না গঙ্গা

তিনি না-জানেন রাম, না-জানেন গঙ্গা।
না-চেনেন মাটি, না-চেনেন মানুষ।
মাটি বলতে তিনি নির্বাচনকেন্দ্র বোঝেন, এবং
মানুষ বলতে ভোটার।
রামপুরের মাটি যে

সাত ফুট জলের তলায় শুয়ে আছে,
এ খবরে তাঁর
সুনিদ্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি,
কেননা
রামপুর তাঁর নির্বাচনকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।
কিন্তু
গঙ্গানগরের গুটি-তিন বাচ্চা এবং জনাকয় থুত্থুড়ে বুড়োবুড়ি যে
বানের জলে ভেসে গিয়াছে,
এই খবর পেয়ে তাঁকে ঘুমের বড়ি খেতে হয়েছিল।

কিন্তু ঘুম ভাঙবার পরে
এখন আবার তাঁর শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে।
কেননা তিনি জানেন যে,
বাচ্চাদের ভোটাধিকার নেই, বেওং
যে গ্রাম থেকে
নিকটতম পোলিং বুথটিও অন্তত আড়াই মাইল দূরে,
পারতপক্ষে
বুড়োরা সেখানে ভোট দেয় না।

পাগলা ঘন্টি

সে যেমন আসে, ঠিক তেমনি চলে যায়।
গল্পে, গানে, ঠোঁট-ফোলানো অভিমানে, প্রকাণ্ড ঠাট্টায়
সব-কিছু ভাসিয়ে তার যাওয়া।
ভোরবেলার হাওয়া
দৌড়তে-দৌড়তে নিয়ে আসে
বৃষ্টির খবর। ঘাসে

দোলা লাগে, চর্তুদিকে বেজে ওঠে অশথ-পাতার
ঝর্ঝর গানের শব্দ, জানালার
পর্দাটা সরালে
দেখা যায় জামরুলের ডালে
খেলা করছে তিনটে-চারটে-পাঁচটা-ছটা পাখি।

আমি তাকে ডাকি,
বলি, চলো, কলকাতায় যাই,
পাতাল-রেলের জন্যে মাটি খুঁড়ি, সুরঙ্গ বানাই,
রাস্তা করি চওড়া, তাতে ছাড়ি
আরও পাঁচশো বাঘমার্কা দোতলা হাওয়াগাড়ি,
পরিচ্ছন্ন করে তুলি মানিকতলার খাল,
হটাই জঞ্জাল
রাস্তা ও ফুটপাথ থেকে,
সদর-দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ি, গৃহস্থকে ডেকে
প্রত্যেকটা বাড়ির কলি
ফেরাই, প্রত্যেকটা কানাগলি
দৃষ্টি পাক,
সন্ধ্যায় প্রত্যেকে তার নিজস্ব নারীর কাছে ফিরে যাক
নিরুদ্বেগ শান্ত মনে।
এখনও নিতান্ত অকারণে
গঙ্গার কিনারে আছে দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে যে ঝুঁকে,
চলো, সেই দ্বিতীয় সেতুকে
ঘাড়ে ধরে হাওড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

চুরাশি-অষ্টাশি
অব্দি কে অপেক্ষা করবে। ধেত্তেরিকা, অদ্দিন কি বাঁচব নাকি?
স্পষ্ট করে এক্ষুণি জানিয়ে রাখি,
পঞ্চাশ পেরুলে

দেখা যায়, মাথার কলকব্জা গেছে খুলে,
কাঠ খেয়েছে ঘুণে আর ইঁট খেয়েছে নোনা।
তোমরা থাকো, আমি আর অপেক্ষা করব না।
পুরনো বিশ্বাসগুলি ধুঁকে মরছে,
পুরনো ঘরবাড়িগুলি মুহুর্মুহু ধসে পড়ছে,
কয়লা পুড়তে পুড়তে হচ্ছে ছাই।

আমার যা-কিছু চাই, এই মুহূর্তে চাই।
যেটা প্রাপ্য, এক্ষুনি তা পাব,
যা-কিছু বানানো হয়নি, এক্ষুনি বানাব।
শুধুই কি রাস্তা, সেতু, ঘড়বাড়ি ও যানবাহন?
তিপান্ন কাহন
সমস্যার খুলতে হবে জট।
চতুর্দিকে আমূল পাল্টাতে হবে দৃশ্যপট।
বৃদ্ধ যাতে ভোলে শোক,
হাসতে-হাসতে খেলতে-খেলতে বেড়ে ওঠে সমস্ত বালক,
ভিটেবাড়ি কোত্থাও না-করে যাতে খাঁ-খাঁ,
না-ভাঙে কোত্থাও কারও শাঁখাঁ,
আর মাছি না-পড়ে কারও ভাতে,
তারই জন্যে দিনে-রাতে
ছুটতে হবে গ্রামে, গঞ্জে, সমস্ত জায়গায়।
আয়,
এই আমার শেষবারের মতো ছুটে যাওয়া।

ভোরবেলার হাওয়া
পাগলা-ঘন্টি বাজাতে-বাজাতে এসে বলল, তুমি কাকে
ডাকছ, সে তো সুবর্ণরেখার বাঁকে

কাল রাতে মিলিয়ে গেছে, আমরাই ক'জন
তাকে নিয়ে তরঙ্গে দিয়েছি বিসর্জন,
তার প্রগল্‌ভ হাসি আর বাজবে না কক্ষনো কোনোখানে।

শ্রাবণের বৃষ্টিধারা আনে
অশত্থ-পাতার
ঝর্ঝর গানের শব্দ, জানালার
পর্দাটা সরালে
দেখা যায় জামরুলের ডালে
খেলা করছে তিনটে-চারটে-পাঁচটা-ছ'টা পাখি।

তবু ডাকি। আজও ডাকি। আসবে না জেনেও তাকে ডাকি।

যাওয়া

মাটিতে চোখ রেখে ঘুরে বেড়াত লোকটা,
কখনও আকাশ দেখেনি।
এখন
খাটিয়ার উপরে
চিতপটাং হয়ে সে শুয়ে আছে, আর
আশ মিটিয়ে আকাশ দেখছে।

জীবনে কখনও ফুলের স্বপ্ন দেখেনি লোকটা,
অষ্টপ্রহর শুধু
ভাতের গন্ধে হন্যে হয় ঘুরত।

এখন তার
তেলচিটে বালিশের দু'দিকে দুটো
রজনীগন্ধার বাণ্ডিল ওরা সাজিয়ে দিল।

এতকাল সে অন্যের বোঝা হয়ে বেড়াত।
আর আজ
তারই নীচে কোমরে-গামছা চার বেহারা।
আকাশ দেখতে-দেখতে,
ফুলের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে
লোকটা এখন গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছে।

শব্দ, শুধু শব্দ

হাজার শব্দ মাথায় ছিল,
হাজার শব্দ বুকে,
আর তা ছাড়া বাপ-পিতেমোর
জং-ধরা সিন্দুকে
শব্দ ছিল দু-তিন হাজার–
খরচা করে সবই
দেখছি তবু হয়নি আঁকা
তোমার মুখচ্ছবি।

দোষ ছিল না শব্দে, শুধু
দোষ ছিল জোড় বাঁধায়,
ভুল-বিবাহের বর-কনে তাই
গড়ায় ধুলো-কাদায়।
এখন ভূমিশয্যা থেকে
কুড়িয়ে তাদের তুলি;

নতুন করে জোড় মিলিয়ে
মেটাচ্ছি ভুলগুলি।

শুধু যাওয়া

কক্ষনো কি তোমাদের কাউকে
এমন কথা বলেছিলুম যে, আমি
পৌঁছে গেছি?
তা হলে তোমরা ধরেই নিয়ো যে,
কথাটা মিথ্যে,
কিংবা আমার বিশ্বাসে অনেক
ভেজাল ছিল।
আমি শুধু যাবার কথাই বলি,
পৌঁছবার কথা বলি না।
আসলে, পৌঁছনোটা যে খুব জরুরী ব্যাপার,
এমন বিশ্বাসই আমার নেই।

যাওয়াতে যারা বিশ্বাস করো,
তারা আমার সঙ্গে চলো।
যারা পৌঁছতে চাও, তারা
এসো না।

স্বদেশ আমার

এ কী স্নেহ! এ কী মায়া! এ কী নিজদেশেও নিয়ত
উদ্বেগে আতঙ্কে যন্ত্রণায়

প্রহর যাপন! এ কী চতুর্দিকে গর্জমান
বৈরী জনতার মধ্যে বন্ধুদের মুখের আদল
উদয়াস্ত
উন্মাদের মতো খুঁজে ফেরা!

মেহেদির বেড়া
কালকেও করেছে রক্ষা উদ্যানের গোলাপগুলিকে।
কালকেও গোলাপ ছিল,
অজস্র টগর জুঁই মল্লিকা ও গন্ধরাজ ছিল।
আজ নেই। অথচ, আশ্চর্য কাণ্ড,
সমূহ শূন্যতা ঘিরে আজকেই বসেছে কাঁটাতার।
ওরা বলে, তুমি তো ভিনদেশি, তুমি আর
এইখানে থেকো না, তুমি যাও।

না-গিয়ে নিষ্কৃতি নেই, কে না জানে।
যেতে-যেতে তবু তুমি পিছনে তাকাও।
ভাবে, কেন যাবে?
এ কি মোহ, এ কি জানো ভূমি যে কখনও
নিজস্ব হবার নয়, এই কথা
মেনে নিতে না-পারার বিড়ম্বনা?
হৃৎপিণ্ডে মোচড় লাগে, চোখ ফেটে সহসা ঝরে পড়ে
নিরুদ্ধ আবেগ।

কোথাও জমে না কিছু মেঘ।
শুধু তাসা-বাদ্য শুনে চমকে ওঠে এ-পাড়া ও-পাড়া,
কঠিন ভ্রূভঙ্গি দেখে মায়ের আঁচলে
মুখ লুকায় শিশু।

এ কী ভ্রান্তি! এ কী অহোরাত্র শুধু অর্থহীন বিসর্জন
স্বদেশে আমার!
কোনোদিকে বোধনের চিহ্ন নেই, কোনো
ঘরে নেই আমন্ত্রণ;
কেউ এসে দাঁড়ায় না কারও পাশে।

তারই মধ্যে আমি দেখছি তোমাকে, যে-তুমি
হাত রেখেছ কাঁটাতারে, চোখ রেখেছে উন্মুক্ত আকাশে।

হাইওয়ে

বিঘের পর বিঘে এখন
সাদা, সটান
রজনীগন্ধার চাষ চলেছে।
খাল, বিল আর
হাজা-মজা পুকুরের ইজারা নিয়ে
ফোটানো হচ্ছে পদ্ম।
অভদ্রা বর্ষাকাল,
শেয়ালে চাটে বাঘের গাল,
উঠোনে এক-হাঁটু কাদা।
অল্প-একটু রোদ উঠতেই
গালফোলা গোবিন্দ সামন্তের বুড়ি-ঠাক্‌মা তাই
পিচঢালা
হাইওয়ের উপরে তার
সাড়ে তিন কাঠা জমির ধান শুকিয়ে নিচ্ছে।

গোবিন্দ কোথায়?
জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে,
যেহেতু এখন 'জমিতে আর কিছুই নাই, বাবু', তাই
হাওড়ার ছেলে গোবিন্দ গিয়ে
মেদিনীপুরের দেউলিয়াবাজারের চায়ের দোকানে
কাজ নিয়েছে।

নদী পেরুলে কোলাঘাট,
কোলাঘাট ছাড়ালে দেউলিয়াবাজার।
সেখানে
বাস থেকে নেমে
উইকএণ্ডের শৌখিন বাবুরা
গোবিন্দ সামন্তের মালিকের দোকান থেকে
একঠোঙা মুড়ি,
বিটনুন-ছেটানো দু-দুটো আলুর চপ, আর
একভাঁড় চা খেয়ে ফের বাসে ওঠে।
তারপর
কেউ ঝাড়গ্রাম, কেউ টাটানগর, কেউ
জুনপুট কি দিঘার দিকে
চলে যায়।

রজনীগন্ধা আর পদ্মগুলো
ঝুড়ি-বোঝাই হয়ে ট্রাকে ওঠে; তারপর
ট্রাক-বোঝাই হয়ে
বিয়েবাড়ি, জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের মঞ্চ আর মড়ার খাটিয়ে
সাজাবার জন্যে
হাওড়া ব্রিজ আর নতুনবাজারের ফুলের দোকানে চলে আসে।
কিন্তু বুড়ি-ঠাক্‌মা তার ধান কিছুতেই

ছাড়তে চায় না।
এন. এইচ. সিক্সের উপরে সারা দুপুর সে তার
ধান আগলে বসে থাকে।
আর
তেরপলে-ঢাকা ট্রাক দেখলেই
লাঠি উঁচিয়ে
কাক তাড়াবার ভঙ্গিতে বলে–হুশ্!